বিধি-নির্দেশিকা

(গ্রাম পঞ্চায়েত)

(প্রথম খণ্ড)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা

কল্যানী, নদীয়া

ভূমিকা

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে পঞ্চায়েতের কাজকর্মের পরিধিও বহুগুন ব্যাপ্ত হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সবার নীচের স্তরে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। যেহেতু সাধারন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয় এই স্তরের প্রতিনিধিদেরই সবচেয়ে বেশী, তাই পঞ্চায়েত পরিচালনার প্রাসঙ্গিক আইন-কানুন সম্পর্কে একটা ধারনা যাতে তারা প্রতি মুহূর্তে পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বিগত দুটি পর্বে রাজ্য সরকার "বিধি নির্দেশিকা" প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে, এই স্তরের প্রতিনিধিরা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রবেশের সাথে সাথেই যাতে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারনা পেতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বিধি নির্দেশিকার প্রথম খন্ড প্রকাশ করা হোল। এখানে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়েরই একটা ধারনা দেওয়া হয়েছে, যা আরও বিস্তারিতভাবে আইন-কানুনের উল্লেখসহ আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় খন্ডে।

যাদের কথা মনে রেখে এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হোল, এটি তাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে এলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করার জন্য রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থার আধিকর্তা ও আধিকারিকদের ধন্যবাদ।

সচিব

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	কেমন করে পঞ্চায়েত গড়ে উঠল	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	গ্রাম পঞ্চায়েত কি কাজ করবে	৪
তৃতীয় অধ্যায়	গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনার পদ্ধতি	১০
চতুর্থ অধ্যায়	অর্থের সংস্থান	১৩
পঞ্চম অধ্যায়	আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা ও নিরীক্ষা	১৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী	২৬
সপ্তম অধ্যায়	প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্য	২৮
অষ্টম অধ্যায়	এক নজরে পঞ্চায়েত পরিচালনা সংক্রান্ত আইন, নিয়মাবলী ও কিছু সহায়ক বইপত্র	৩২

প্রথম অধ্যায়

কেমনকরে পঞ্চায়েত গড়ে উঠল

'পঞ্চায়েত' কথাটির সাধারন মানে হোল পাঁচজন এক জায়গায় বসে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো কাজ করা। অনেক আগে গ্রামের নাটমন্দির বা বাঁধানো বটতলায় বসে সমাজপতিরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে যেমন গ্রামের অনেক সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলতেন তেমনি আবার স্থানীয় উন্নয়নের কাজও তারা করতেন। কখনও কখনও গ্রামে খরা, বন্যা, মহামারি দেখা দিলে তাকে মোকাবিলাও করতেন গাঁয়ের মানুষেরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে।

ইংরেজ আমলে কিন্তু এই ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ল আস্তে আস্তে। এই ধরনের জমায়েতকে তাঁরা দেখতেন ইংরেজ বিরোধী আলোচনার জায়গা হিসাবে। তবে গ্রামীন জীবনের রোজকার আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আর গ্রামের ভেতরকার খবরাখবর জোগারের জন্য রীতিমত আইন করে তৈরি করা হোল চৌকিদার দফাদার বাহিনী। এছাড়াও তলা থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক চাপকে মোকাবিলা করার জন্য অনুগত সমাজপতিদের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হোল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন করে।

এই আইনগুলির বলে জেলা বোর্ড, মহকুমা বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হোল ঠিকই কিন্তু তাদের কাজের পরিধি থাকলো সীমিত। খুব ছোট গন্ডীর মধ্যে থেকে মূলত স্বাস্থ্যবিধান, রাস্তাঘাট রক্ষনাবেক্ষন, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা এইসব কাজের দায়িত্ব বর্তালো এদের উপর। কিন্তু আর্থিক ক্ষমতা এবং জনগনের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ না থাকায় বৃহত্তর মানুষের কাছে এরা পৌঁছোতে পারল না।

স্বাধীনতার পর ভারতে সংবিধানের মাধ্যমে দেশে গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হোল ঠিকই কিন্তু নির্বাচিত সরকারের ব্যবস্থা থাকল কেবল কেন্দ্রে এবং রাজ্যে। তার নিচে গ্রাম বা শহরের জন্য নির্বাচিত সরকার গঠনের জন্য চিন্তাভাবনা করার দায়িত্ব দেওয়া হোল রাজ্য সরকারগুলির উপর। একইসঙ্গে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়ন কমসূচীর মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হোল।

কিন্তু কিছুদিন পরেই সমীক্ষা করে দেখা গেল যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তা সফল হয়নি। বলা হোল জনসাধারনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহন না করাই

এই কর্মসূচীর ব্যর্থতার প্রধান কারন। তাই উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগনকে সামিল করার জন্য রাজস্থান, কর্নটিক, তামিলনাড়ু এবং গুজরাটের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৫৭ এবং ১৯৬৩ সালে পঞ্চায়েত সংক্রান্ত দুটি আইন তৈরি হোল। কিন্তু মজার কথা হোল এত সবের পরেও জনগনের অংশগ্রহন যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেল। পঞ্চায়েত থাকলো কেবল কাগজে কলমে পরে এই দুটি আইনের উপর ভিত্তি করেই ১৯৭৩ সালে তৈরি হোল পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন। এই আইনেই পঞ্চায়েতে তিনটি স্তরের কথা বলা হোল - গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ।

বিতর্ক আর আলাপ আলোচনা কিন্তু এ সম্পর্কে চলছিলই। ১৯৭৭ সালে এ বিষয়ে আর একটি কমিটি গঠন করা হলে সেই কমিটি তার রিপোর্টে বলে যে, রাজনৈতিক দলগুলির সরাসরি অংশগ্রহনের মাধ্যমে যথাসময়ে নির্বাচনের দ্বারা সমৃদ্ধ গ্রাম জীবন তৈরীতে সাহায্য করতে পারে পঞ্চায়েত-ই। এই সুপারিশের পরবর্তি সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহনের মাধ্যমে ১৯৭৮ সালে প্রথমবারের মতো পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হলেও ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এ বিষয়ে তেমন কোন অগ্রগতি ঘটেনি। অতীতে দু'একটি কমিটি পঞ্চায়েতকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করলেও তা কার্যকরী হয় নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৬ সালে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশ ক্রমে ১৯৯২ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সারা ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরী হয়। নিয়মিত নির্বাচন বাধ্যতামূলক করা হয়, মহিলা এবং তপঃ জাতি ও আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য অর্থ কমিশন গঠনের নির্দেশসহ পঞ্চায়েতের কাজকর্মে জনগনের অংশগ্রহন সুনিশ্চিত করার জন্য "গ্রামসভা" গঠনের কথাও বলা হয়। এক কথায় সারা ভারতের পঞ্চায়েত আন্দোলনের এই সংবিধান সংশোধন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

পশ্চিম বাংলার অগ্রগতি

১৯৭৮ সালের পর পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অনেকটা এগিয়ে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলির সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া হওয়া এই রাজ্যেই প্রথম।

এখানে নিয়মিত নির্বাচন হয়েছে। গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকার ফলে পঞ্চায়েত গ্রামের মানুষের কাছে একান্ত নিজস্ব ও অপরিহার্য সংস্থা হয়ে উঠেছে।

রাজ্য সরকার সংবিধান সংশোধনকে মাথায় রেখে পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করেছেন। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের বিধানের বাইরে আরও কয়েকটি গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজ্য আইনে সংযোজিত হয়েছে। যেমন, গ্রাম সংসদ গঠন, জেলা কাউন্সিল গঠন, দলত্যাগ-বিরোধী ব্যবস্থা ইত্যাদি। এছাড়া সংবিধান সংশোধন আইন কার্যকরী হবার আগেই এ রাজ্যে মহিলা,তপঃ জাতি, আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষন, গ্রামসভা গঠন এবং অর্থ কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্বাচন হয়েছে এসবের ভিত্তিতে। আবার সংবিধান সংশোধনের পরও ঐ সংশোধনীর প্রয়োজন অনুযায়ী রাজ্যের আইনকে সংশোধন করা হয়েছে। এসবের ফলে পঞ্চায়েত পরিচালনায় স্বচ্ছতার দৃষ্টিভঙ্গী খুঁজে পাওয়া গেছে এবং মানুষের অংশগ্রহন সহজতর হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রাম পঞ্চায়েত কি কাজ করবে

সমাজে আমরা সবাই একসঙ্গে থাকি, কিন্তু সকলের অবস্থা সমান নয়। অল্পসংখ্যক মানুষ সব দিক থেকে এগিয়ে আছে আর বেশীর ভাগ মানুষ সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে। এই পিছিয়ে পড়া মানুষেরা সব দিক থেকে বঞ্চিত। প্রথমত, অর্থনৈতিক বঞ্চনা। দেশের অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। বেশিরভাগ মানুষ হয় সম্পদহীন নয়তো সামান্য সম্পদের অধিকারী। ফলে সুস্থ ও সক্ষমভাবে বেঁচে থাকতে গেলে যা সব মৌলিক প্রয়োজন - খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা - তা থেকে বেশীরভাগ মানুষই বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, সামাজিক বঞ্চনা। জাতপাত, ধর্ম ইত্যাদির ভেদাভেদ মানুষে মানুষে এক কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত, লিঙ্গভেদের বঞ্চনা। পুরুষের তুলনায় মেয়েরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত, শিক্ষাগত ও আইনগত - সমস্ত দিক থেকেই বঞ্চিত।

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি নাগরিককে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। আর সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য হবে সামাজিক সুবিচার ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে পরিকল্পনা রচনা করা ও প্রকল্প রূপায়ন করা।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতগুলির কাছে এই কাজ নতুন নয়। কেননা এর অনেক কাজই রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের হাতে অনেক আগেই দিয়েছেন। রাজ্যের আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হোল অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, যেমন- স্বাস্থ্য জল নিষ্কাশন, রোগ প্রতিরোধ, পানীয় জল, রাস্তাঘাট নির্মান, জনগনের জায়গা বা রাস্তা জবরদখল উচ্ছেদ, গৃহনির্মান ও সংরক্ষন, সরকারী পুকুরের রক্ষনাবেক্ষন, স্বেচ্ছা শ্রমদানের উদ্যোগ গ্রহন ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হোল রাজ্য সরকার দায়িত্ব দিলে যে সব কাজ করা যাবে- যেমন, প্রাথমিক, বয়স্ক, প্রথাবর্হির্ভূত সামাজিক ও কারিগরি শিক্ষা, গ্রামীন চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতি ও শিশুকল্যান, ফেরি পরিচালন, সেচব্যবস্থা, কৃষি, প্রতিবন্ধী-কল্যান, উদ্বাস্তু পুর্নবাসন, পশু চিকিৎসা ও পালন, পতিত জমি উদ্ধার, অকৃষি জমি কৃষিযোগ্য করা,

বনসৃজন, ভূমি সংস্কার, গ্রামীন বৈদুতিকরন, অচিরাচরিত শক্তি, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, বাজার, হাট বসানো, মেলা, মৎস্য চাষ, দারিদ্র্য দূরীকরন, মৃত জীবজন্তুর সৎকার ইত্যাদি। এছাড়াও আছে কিছু ইচ্ছাধীন কাজ, যেমন ফি, অভিকর ইত্যাদি আদায়ের মাধ্যমে এলাকার পানীয় জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এই সঙ্গে রাজ্য সরকার আদেশ জারি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর এলাকার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্ব দিয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা এ ক্ষেত্রে অবর নিবন্ধক হিসাবে কাজ করবেন। আবার কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বা জেলা পরিষদ যদি আলাদা করে গ্রামোন্নয়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে কোন প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্ব দেন তবে সে কাজও তারা ঐ সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবেন। এই মুহুর্তে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার গ্রামোন্নয়নের যে যে প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্ধ করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরন এই অধ্যায়তে শেষে দেওয়া হোল।

কাজ করার জন্য পরিকল্পনা

এই সব কাজ গুছিয়ে করার জন্য চাই পরিকল্পনা। গ্রামের মানুষের সমস্যার বিশালতার তুলনায় সমস্যা সমাধানের জন্য যে সম্পদ ও অন্যান্য সুযোগ দরকার, তা অপ্রতুল। তাই সবার আগে গ্রামগুলিতে সমীক্ষা করে জেনে নিতে হবে কারা ঠিক কোন সমস্যায় কিভাবে জর্জরিত। একই সঙ্গে জানতে হবে গ্রামে কি কি সম্পদ আছে, যা দিয়ে অনেক সমস্যা গ্রামে বসেই মিটিয়ে নেওয়া যায়। এই সমীক্ষার কাজ থেকে শুরু করে পরিকল্পনা প্রনয়ন পর্যন্ত সব কাজটাই করবেন গ্রামের মানুষেরা। পঞ্চায়েত তাদের কার্যকরী সহায়তা প্রদান করবে।

কাজ আজকে আরম্ভ করলে কালই তার ফল পাওয়া যাবেনা। এই কারনে প্রত্যেক পরিকল্পনারই একটা ন্যায্য সময়সীমা থাকা দরকার। কতটা কাজ ১ বছরে করা যাবে, কোন কাজের জন্য ৪/৫ বছর লাগবে। আবার কোন কোন কাজ আদৌ করা যাবেনা - এসব বিষয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিগন ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এই কারনে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চাযেতে প্রতি ৫ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে। এই পরিকল্পনাকে মাথায় রেখে প্রত্যেক বছর যতখানি কাজ করা যাবে তার জন্য দরকার একটি বার্ষিক পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনা গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার অধিবেশনে দাখিল করতে হবে এবং উভয় সভার সুপারিশ নিয়েই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে।

চাই গন উদ্যোগ ও স্বনির্ভরতা

শুধু সংবিধান, আইন বা রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করতে পারেনা। এর জন্য চাই গন সমর্থন ও গন উদ্যোগ। মানুষকে সঙ্গে নিতে পারলে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধানের পথ বার করা যায়। কোন কাজ করা উচিৎ, কেমনভাবে করা উচিৎ এসব সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েত নেবে ঠিকই কিন্তু খেয়ালখুশি মত নয়, জনগনের মত নিয়ে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে। তবেই পঞ্চায়েত সফল হবে। জনগনও কাজের আনন্দ পাবে। নিজেদের দুর্বল মনে করবে না।

পাশাপাশি এটাও মানুষকে জানাতে হবে যে পঞ্চায়েতের সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য খুব কম। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার যে অর্থ দেন শুধু তার উপর নির্ভর করেই মানুষের চাহিদা মত সব কাজ করা যাবেনা। তাই মানুষকে বোঝাতে হবে যে তাদের সঙ্গে পঞ্চায়েতের সম্পর্ক দাতা গ্রহীতার নয়। পঞ্চায়েতের কাজকে যদি মানুষের নিজের কাজ বলে বোঝান যায় এবং মানুষকে যদি কাজের সহভাগী করা যায়, তবে তারা অনেকেই এই কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দেবেন এমনকি আর্থিক বা অন্যান্য সহায়তাও পাওয়া যাবে। এই সদিচ্ছাকে কাজে লাগাতে হবে এবং পঞ্চায়েতকে স্বনির্ভরতার দিকে এগোতে হবে।

স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও যৌথ সিদ্ধান্ত

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত কি করতে চায় এবং কিভাবে করতে চায়, এই কাজ করতে গিয়ে কোথা থেকে কি টাকা পয়সা পাওয়া গেছে এবং তা কিভাবে, কোথায় কত খরচ হয়েছে এসব পরিষ্কার করে জনসাধারনের কাছে তুলে ধরতে হবে। তবেই পঞ্চায়েতের কাজে মানুষের আস্থা বাড়বে, বেশী বেশী মানুষ পঞ্চায়েতের কাজে এগিয়ে আসবে।

পঞ্চায়েতের সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালনে নির্বাচক তথা জনসাধারনের কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতা শুধু দায়িত্ব পালন করলেই শেষ হবে না, কেমন করে তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবিষয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করাই হোল আসল দায়বদ্ধতা।

পঞ্চায়েতকে শুধু জনমুখী করলেই হবেনা, জনগনকেও পঞ্চায়েতমুখী করতে হবে। এই কাজ সম্ভব একমাত্র যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেবার মাধ্যমে। এর মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত রূপায়নেও জনসাধারনের একটা দায়িত্ব এসে যাবে।

তাই সার্বিক স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও যৌথ সিদ্ধান্ত - এই তিনটেকে কাজের মূল মন্ত্র হিসাবে গ্রহন করতে হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীগুলিকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায় - (১) অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং (২) সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প।

অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় - (১) মজুরি ভিত্তিক প্রকল্প (২) স্বনিযুক্তি প্রকল্প।

একনজরে মজুরি ভিত্তিক প্রকল্প

১) সম্পূর্ন গ্রামীন রোজগার যোজনা
২) ইন্দিরা আবাস যোজনা
৩) একাদশ অর্থ কমিশন তহবিল
৪) সাংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প
৫) বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প
৬) জেলা পরিকল্পনা তহবিল

একনজরে মজুরি ভিত্তিক প্রকল্প

১) স্বর্নজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা
২) তপঃ জাতির বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা (এস. সি. পি.)
৩) আদিবাসী উপপরিকল্পনা (টি. এস. পি.)
৪) প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা
৫) খাদি ও গ্রামীন শিল্প কর্মসূচী

৬)	মৎস্য চাষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী

৭)	রেশম শিল্প ও সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী

৮)	প্রাণী সম্পদ বিকাশ কর্মসূচী

৯)	কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী

একনজরে সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প

১)	সর্ব্ব শিক্ষা অভিযান কর্মসূচী

২)	প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচী

৩)	শিশু শিক্ষা কর্মসূচী

৪)	সুসংহত শিশু বিকাশ কর্মসূচী

৫)	বহুমুখী স্বাস্থ্য কর্মসূচী

৬)	গ্রামীন সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী

৭)	জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প

৮)	ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প

৯)	প্রতিবন্ধী কল্যান কর্মসূচী

১০)	সামাজিক নিরাপত্তা বিমা প্রকল্প

১১)	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা প্রকল্প

১২)	অন্নপূর্ণা অন্ন যোজনা প্রকল্প

এছাড়াও আছে রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরগুলির কিছু প্রকল্প। এক কথায় উন্নয়নের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং বাস্তবে গ্রামোন্নয়নের কাজে নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্যকে সমস্ত ধরনের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। কাজেই কর্মসূচীগুলি সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে হলে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, সব ধরনের কর্মসূচিরই প্রধান লক্ষ্য সমাজের সমস্যা - দারিদ্র ও বেকারত্ব দূর করতে সহায়তা করা, যাতে সমাজে বর্তমান ও নিরন্তর ক্রিয়াশীল নানা বৈষম্য কমানো যায়, মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটে এবং সামগ্রিক জীবনের মান উন্নত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনার নিয়ম

গ্রাম পঞ্চায়েতের সব কাজই করতে হবে সদস্যরা সবাই মিলে মিটিংয়ে আলোচনা করে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যদের ঐক্যমত অথবা বেশীরভাগ সদস্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাগুলি চার ধরনের হতে পারে - সাধারন সভা, বিশেষ সভা, জরুরী সভা এবং তলবী সভা।

সাধারন সভা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার হবে। বিশেষ বা জরুরী সভার আলোচ্য সূচীতে একটির বেশী বিষয় রাখা যাবে না। এক তৃতীয়াংশ সদস্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য প্রধানকে লিখিতভাবে অনুরোধ করলে প্রধান তলবী সভা ডাকবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল প্রকার সভাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে হবে। সেই সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সভায় উপস্থিত হলেই সভায় 'কোরাম' হবে এবং সভা করা যাবে। যদি সভা শুরুর নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে ওই সংখ্যার সদস্য উপস্থিত না হন তবে সভা মুলতবী সভায় কোরাম না হলেও সভা করা যাবে। মূল সভার আলোচ্য সূচীই মূলতবি সভার আলোচ্য সূচি হবে।

মিটিংয়ে সভাপতি হবেন সাধারনত প্রধান। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান। দু'জনেই যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে উপস্থিত সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে মিটিং-এর সভাপতি নির্বাচিত করবেন। মিটিংয়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা হবে, তা প্রধান বা উপ-প্রধানের পরামর্শে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব প্রস্তুত করবেন এবং এজেন্ডা বইতে প্রতি-স্বাক্ষর করবেন।

'জরুরী অধিবেশন' বাদে অন্য সব মিটিং করার অন্তত সাত দিন আগে মিটিংয়ের লিখিত নোটিশ সদস্যদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জরুরী মিটিং তিন দিনের নোটিশ দিয়ে ডাকা যাবে। জরুরী মিটিংয়ে কেবল একটি বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। নোটিশে মিটিংয়ের সময়, তারিখ, স্থান এবং আলোচনার বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে লেখা থাকবে। নোটিশের একটি কপি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে টাঙিয়ে দিতে হবে। মিটিংয়ের কাজ শুরু করার আগে সভাপতি দেখে নেবেন সব সদস্য লিখিত নোটিশ পেয়েছেন কি না। যদি দেখা যায় কোনও

সদস্য নোটিশ পান নি, তবে মিটিং করা যাবে না। গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব মিটিংয়ের নোটিশ বার্তাবহ দিয়ে সদস্যদের কাছে পাঠাবেন এবং সদস্য যে নোটিশ পেয়েছেন তার লিখিত প্রমান সচিব রাখবেন।

মিটিংয়ের স্থানে সদস্যদের উপস্থিতি জানাবার জন্য একটি হাজিরা খাতায় সই করতে হবে।

মিটিংয়ের এজেন্ডা বইতে লেখা বিষয়গুলি পর-পর আলোচিত হবে এবং সিদ্ধান্তগুলি মিটিং বইতে সচিব লিখে রাখবেন। সব বিষয়গুলি আলোচনার পর মিটিং বইতে লেখা সিদ্ধান্তগুলি পড়ে শোনাতে হবে এবং মিটিংয়ের সভাপতি ওই বইয়ে সই করবেন। কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে বেশীর ভাগ সদস্যের মতই গ্রহন করা হবে এবং সে-জন্য প্রয়োজন হলে ভোট নিতে হবে। ভোটের ফল যদি সমান-সমান হয়, তবে মিটিংয়ের সভাপতি দ্বিতীয়বার ভোট দিয়ে সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করবেন। মিটিংয়ের সভাপতির এই দ্বিতীয়বার ভোট দেবার যে ব্যবস্থা আছে তাকে বলে 'নির্ণায়ক' বা 'কাস্টিং' ভোট। গ্রাম পঞ্চায়েত মিটিংয়েই পরবর্তি মিটিংয়ের তারিখ ও সময় ঠিক করে নিতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ (কমপক্ষে তিন জন) লিখিতভাবে প্রধানকে কোনও সভা ডাকতে বললে, প্রধান মিটিংয়ের সময় ও তারিখ ঠিক করে, স্থানীয় বি.ডি.ও.-কে জানিয়ে ও সদস্যদের অন্তত সাত দিনের নোটিশ দিয়ে একটি মিটিং ডাকবেন। সদস্যদের লিখিত নোটিশ পাবার পনেরো দিনের মধ্যে এই মিটিং হতে হবে। এ-ধরনের সভাকে 'তলবী সভা' বলে।

সদস্যদের নোটিশ পাবার ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান যদি 'তলবী সভা' না ডাকেন, তাহলে সদস্যরা, বি.ডি.ও.-কে জানিয়ে প্রধান ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্যকে ৭ দিনের নোটিশ দিয়ে, ৩৫ দিনের মধ্যে মিটিংটি ডাকতে পারেন। ওই মিটিং নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। বি.ডি.ও. এই মিটিংয়ের জন্য একজন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে পারেন। পর্যবেক্ষক মিটিংয়ের কার্যবিবরন সম্পর্কে একটি লিখিত রিপোর্ট মিটিং হয়ে যাবার ৭ দিনের মধ্যে বি.ডি.ও.-র কাছে পেশ করবেন। ওই রিপোর্ট পাবার পর বি.ডি.ও. যা উপযুক্ত বলে মনে করবেন, সেইমত ব্যবস্থা নেবেন।

কাজ ভাগ করে নিতে হবে

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্মের পরিধি বহুগুন বেড়ে যাওয়ার ফলে পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালন পদ্ধতির একটি নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম মিটিংয়ের তিন মাসের মধ্যে একটি বিশেষ মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে তার ক্ষমতা, কাজ ও দায়িত্বকে যে রকম দরকার বুঝবে সে রকম কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করবে এবং এক বা একাধিক ভাগের দায়িত্ব এককভাবে একজন সদস্য বা যৌথভাবে একাধিক সদস্য-গোষ্ঠীর (গ্রুপ) উপর অর্পন করবে। তবে প্রতিটি সদস্যকে এককভাবে বা অন্য সদস্যদের সঙ্গে যৌথভাবে এক বা একাধিক ভাগের দায়িত্ব অর্পন করতে হবে। প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েত একাধিক মিটিংয়ে এ বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহন করতে পারবে।

প্রতিটি সদস্য-গোষ্ঠীর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এ গোষ্ঠীরই একজন সদস্যকে গোষ্ঠীর আহ্বায়ক মনোনীত করবে। তিনি গোষ্ঠীর সভা আহ্বান করবেন এবং তাঁর বিভিন্ন কাজের রিপোর্ট প্রধানের কাছে ও তাঁর মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পেশ করবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত নারী ও শিশু উন্নয়ন, তফসিলী জাতি ও আদিবাসী মঙ্গল, পরিবার-কল্যান ও অন্যান্য সমাজ-কল্যান কর্মসূচী বিষয়ে ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে এক বা একাধিক ভাগ গঠন করবে এবং এই ভাগগুলির দায়িত্ব এককভাবে কোন মহিলা সদস্য বা গোষ্ঠীকে অর্পন করবে। এই ধরনের গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য হবেন মহিলা এবং গোষ্ঠীর যে কোন একজন মহিলা সদস্য হবেন আহ্বায়ক।

যৌথ কমিটি

অনেক সময় দেখা যায় যে কোনও একটি প্রকল্প একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের উপকারে লাগবে অথবা প্রকল্পটির জন্য যে জায়গা দরকার তা হয়তো ছড়িয়ে আছে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই ধরনের প্রকল্প একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে রূপায়ন করা সম্ভব নয়। তখন দুই বা তার বেশী গ্রাম পঞ্চায়েতকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে দুই বা তার বেশী গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ স্বার্থে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সদস্য নিয়ে লিখিত চুক্তি করে একটি যৌথ কমিটি গঠন করতে পারেন। এই যৌথ কমিটি চুক্তি কমিটি অনুযায়ী সেই প্রকল্পটি দেখাশোনা করতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থের সংস্থান

গ্রাম পঞ্চায়েত চরিত্রগতভাবে স্থানীয় সরকার। তাই কেন্দ্র ও অন্যান্য সরকারের মত নিজ এলাকায় কর, শুল্ক, মাশুল ইত্যাদি, ধার্য্য ও আদায় করার আইনগত ক্ষমতা তার রয়েছে। এই আর্থিক ক্ষমতাই তার আত্মনির্ভরতার অন্যতম পাথেয়। সাধারন মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অনেক কিছু আশা করেন। এই কাজ করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত্কে আর্থিক ক্ষমতা ব্যবহার করেই এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে যে যদি তাকে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকারের চরিত্র ও মর্যাদা অর্জন করতে হয় তবে তাকে যথাসম্ভব স্বনির্ভর হতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎসগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায় এগুলি হোলঃ

(১) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ধার্য কর, শুল্ক, মাশুল ইত্যাদি ;

(২) স্কুল, হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, হলঘর, বাজার, বিশ্রামগৃহ ইত্যাদি সাধারনের প্রয়োজনে লাগে এমন সম্পদের নিয়ন্ত্রন, রক্ষনাবেক্ষন বা ব্যবস্থাপনা যদি পঞ্চায়েতের হাতে থাকে, তবে সেবা দেওয়ার বিনিময়ে পঞ্চায়েত যদি কিছু আয় করেন, তবে সেই আয় ;

(৩) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার অথবা জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির কাছ থেকে পাওয়া কোনও অনুদান বা অন্য ধরনের আর্থিক সাহায্য ;

(৪) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার অথবা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা ঋন ;

(৫) কোনও দান থেকে সংগৃহীত অর্থ ;

(৬) গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রকল্প বাবদ কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ ;

জমি ও গৃহাদির উপর কর

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যাঁরা জমি বা বাড়ির মালিক অথবা জমি বা বাড়ির দখলকারী, তাঁদের উপর কর ধার্য করা যাবে। যে সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য এক হাজারের বেশী, সেক্ষেত্রে বার্ষিক মুল্যের শতকরা দুই ভাগ এবং যে সম্পত্তির বাষিক মূল্য এক হাজার টাকার কম, সেক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিককে কর থেকে রেহাই দেওয়া হবে।

মনে রাখা প্রয়োজন, কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন জমি জমা ও ঘর বাড়ি যদি লাভজনক উদ্দ্যেশ্যে ব্যবহার না করে, শুধুমাত্র কল্যানমুলক কাজে ব্যবহার করা হয়, অথবা যে সম্পত্তি সম্পুর্নভাবে ধর্মীয়, শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্দ্যেশ্যে ব্যবহার করা হয়, সে সব সম্পত্তিও কর থেকে রেহাই পাবে। কোনও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিও এরকম কর রেহাই পাবে। তাছাড়া, রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যে কোনও সম্পত্তি বা কোনও বিশেষ শ্রেনীর সম্পত্তির উপর পুরোপুরি কিংবা আংশিকভাবে কর ধার্য করা থেকে রেহাই দেবার নির্দেশ দিতে পারেন

বার্ষিক মুল্য

বার্ষিক মূল্য বলতে বোঝাবে কর ধার্য করবার সময় সম্পত্তির বাজার দরের শতকরা ছয় ভাগ মূল্য। ধরা যাক, কোন সম্পত্তির বাজার দর দশ হাজার টাকা, তাহলে বার্ষিক মূল্য হবে বাজার দরের শতকরা ছয় ভাগ অর্থাৎ ছয় শত টাকা (১০,০০০×৬/১০০=৬০০.০০)। এক্ষেত্রে সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য যেহেতু এক হাজার টাকার কম সেইজন্য বার্ষিক কর হবে ৬০০ টাকার শতকরা একভাগ অর্থাৎ ছয় টাকা। আবার সম্পত্তির বাজার দর যদি কুড়ি হাজার টাকা হত তাহলে তার বার্ষিক মুল্য হত বারো শত টাকা। সেক্ষেত্রে সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য এক হাজার টাকার বেশী হওয়ায় বার্ষিক কর হবে শতকরা দুইভাগ অর্থাৎ চব্বিশ টাকা।

এছারা রাজ্য সরকারের নির্ধারিত হারে উপবিধি প্রনয়ন করলে গ্রাম পঞ্চায়েত নিম্নলিখিত ফি, উপকর ডিউটি, লাইসেন্স ফি ইত্যাদি আদায় করতে পারে কোন ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ কত টাকা নেওয়া যাবে তার একটি তালিকাও রাজ্য সরকার প্রকাশ করেছেন।

উপকর, স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়

এলাকায় অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর, দান, বন্ধক, ইজারা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপকর আদায় করা যাবে। এছারা এলকার প্রমোদ অনুষ্ঠানের প্রবেশ মূল্যের উপর অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি ধার্য করা যাবে।

যানবাহনের লাইসেন্স

গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফি এবং অভিকর ধার্য করতে পারেন। যানবাহন যথা রিক্সা, ঠেলাগাড়ি, রাবারের টায়ার লাগানো গরুর গাড়ি, টায়ার ছাড়া গরুর গাড়ি এবং অন্যান্য গাড়ির জন্য লাইসেন্স দেবার ক্ষেত্রে মাশুল (ফি) ধার্য করতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি করা যানবাহনের জন্য লাইসেন্স দিতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দেবস্থান, তীর্থস্থান, প্রদর্শনী ও মেলায় জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য সরকার কতৃক নির্দিষ্ট হারে ফি ধার্য করা যাবে।

ফি, অভিকর, টোল ধার্য

জনপথে, সার্বজনীন স্থানে এবং রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করলে, গ্রাম পঞ্চায়েত সে জন্য অভিকর ধার্য করতে পারবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জল, সেচের জল কিংবা অন্য কোনো উদ্দ্যেশ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করলে, জলকর ধার্য করা যাবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যাক্তি বিশেষের পায়খানা, প্রস্রাবাগার ও আবর্জনা ফেলার স্থান পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করলে, সে কাজের জন্যও অভিকর ধার্য করতে পারেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় কোনও সড়ক বা ব্রিজ অথবা ফেরি সার্ভিস থাকতে পারে। এসব সড়ক বা ব্রিজ বা ফেরি সার্ভিস ব্যবহার করার জন্য, ব্যবহারকারীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে টোল আদায় করা যাবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত তার এলাকায় এই সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসারে সৌখিন পশু-পাখী পোষার জন্য লাইসেন্স ও তার জন্য মাশুল (ফি) আদায় করতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে বানিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত শক্তিচালিত অগভীর নলকুপের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ধার্য করতে পারে।

যদি কোনো যানবাহন চলতি কোননও আইন বলে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা ইতিমধ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়ে থাকে, কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দেবস্থান, তীর্থস্থান, প্রদর্শনী বা মেলাস্থলে ইতিমধ্যে অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ জনস্বাস্থ্যমুলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন, তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত ওই যানবাহন পুনরায় রেজিষ্ট্রি করবেন না বা দেবস্থান ইত্যাদি স্থানে জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা নেবেন না বা ফি ধার্য করবেন না।

সরকারী ও ব্যাঙ্ক ঋন

গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ঋন নিতে পারবে। এছাড়া ব্যাঙ্ক অথবা অন্যান্য অর্থসংস্থার কাছ থেকেও ওইরকম প্রকল্পের জন্য ঋন নিতে পারে। ঋন নিলে তা সুদ সহ শোধ দিতে হয়। ফলে, ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য অর্থসংস্থা বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ঋন নিয়ে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ন করার কথা যদি ভাবা হয়, তাহলে সেই ধরনের প্রকল্প বেছে নিতে হবে, যা থেকে আয় করা যায় এবং এই আয় থেকে ঋনের টাকা এবং সুদ ঠিক সময়ে শোধ করা যায়। এমন অনেক প্রকল্পের কথাই গ্রাম পঞ্চায়েত ভাবতে পারে, যেমন সেচ প্রকল্প, শস্যের গুদাম হাট বা বাজার উন্নয়ন বিশ্রামাগার ইত্যাদি। এসব প্রকল্পের উপকৃত ব্যাক্তিদের কাছ থেকে ভাড়া, ফি ইত্যাদি আদায় করা যায়। এই আদায় থেকে যদি ঋন এবং সুদ শোধ করার সম্ভাবনা থাকে এবং আদায় করার ব্যবস্থা বরা যায়, তবেই ঋন নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে অনেক গ্রামেই এই সম্ভাবনা আছে। পঞ্চায়েতগুলিকে তাই এদিকে নজর দিতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘর-বাড়ি নির্মান

পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম এলাকায় গৃহনির্মান সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়া কোননও ব্যাক্তি নতুন কোননও গৃহনির্মান করতে পারবেন না। বর্তমান গৃহের পরিবর্তন করার ক্ষেত্রেও গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি নেবুর প্রয়োজন হবে। তবে ১৮ বর্গমিটারের কম জায়গায় ইটের দেয়াল না দিয়ে খড়, টিন, টালি ইত্যাদির ছাউনি দিয়ে কোনও কাঠামো তৈরী করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি লাগবে না।

রাজ্য সরকার ইচ্ছে করলে যে কোনো কাঠামো বা বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে পঞ্চায়েতের অনুমতি নেওয়া থেকে রেহাই দিতে পারেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যিনি গৃহনির্মান করতে চান তিনি, পঞ্চায়েতের কাছে একটি ফর্মে দরখাস্ত করবেন। দরখাস্তের সঙ্গে ফি দিতে হবে, ফি-র পরিমান কত হবে তা কাঠামো বা বাড়ির আয়তন ও কিভাবে ব্যবহার হবে তার উপর নির্ভর করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট করা আছে। এই পুস্তিকার দ্বিতীয় খন্ডে এ বিষয়ে আরও বিশদ ভাবে বলা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আয় ব্যায়ের হিসাব রক্ষা ও নিরীক্ষা

গ্রাম পঞ্চায়েতের পাওয়া সকল প্রকার অর্থই হোল জনসাধারনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভভাবে পাওয়া অর্থ। তাই এই অর্থের ঠিক ঠিক হিসাব রাখা অত্যন্ত জরুরী কাজ। এই কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হবে যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাব পত্রে স্বচ্ছতা বজায় থাকে। সবসময় আয় বুঝে ব্যায় করাটাই হোল বুদ্ধিমানের কাজ। সে জন্য আর্থিক বছর শুরুর আগেই ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে কোথা থেকে কি টাকা পয়সা পাওয়া যেতে পারে তা জেনে বুঝে নিতে হবে।

বাজেট

প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে পরের বছরের আয় ও ব্যায়ের আনুমানিক হিসাব দেখিয়ে একটি বাজেট তৈরী করবে। প্রথমে প্রতি বছর ১৫ ই অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক খসরা বাজেট বিবেচনা করার জন্য প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বিশেষ সভা ডাকবেন। সভায় আলোচনার ভিত্তিতে প্রাথমিক খসরা বাজেট প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর ১ লা নভেম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের আর একটি বিশেষ সভা ডেকে সংশোধিত প্রাথমিক খসড়া বাজেটকে খসড়া বাজেট হিসাবে অনুমোদন করতে হবে। খসড়া বাজেটের একটি অনুলিপি মতামতের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিকে পাঠাতে হবে।

৩০ শে নভেম্বরের মধ্যে গ্রাম সংসদগুলির সভা ডেকে সেই সভায় খসড়া বাজেট পেশ করতে হবে। ৩১ শে ডিসেম্বরের মদ্যে গ্রামসভার অধিবেশন ডেকে সেখানে খসড়া বাজেট, বাজেট সম্পর্কে পঞ্চায়েত সমিতির মতামত, গ্রাম সংসদগুলির মতামত, সুপারিশ ও সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে। গ্রাম সভা খসড়া বাজেট এবং বিভিন্ন সুপারিশ ও মতামত আলোচনা করে বাজেট সংশোধন সম্পর্কে যে সুপারিশ করবে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩১ শে জানুয়ারীর মধ্যে বিশেষ সভা ডেকে গ্রাম পঞ্চায়েত খসড়া বাজেট এবং বিভিন্ন সংশোধন প্রস্তাব প্রভৃতি বিস্তারিত আলোচনা করে বাজেট চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবে। অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কোন আর্থিক ব্যয় করতে পারে না। মনে রাখতে

হবে যে, ৩১ শে মার্চের মধ্যে বাজেট অবশ্যই অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। নির্দিষ্ট ফর্মে বাজেট তৈরী করার সময় গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট রিপোর্ট এবং অন্যান্য আয় ও ব্যয়ের হিসাবপত্রের সাহায্য নিতে হয়।

হিসাব সংরক্ষণ

গ্রাম পঞ্চায়েতের যাবতীয় হিসাব ও খাতাপত্র বাংলা কিংবা ইংরেজি ভাষায় লিখতে হবে। দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হিসাব নেপালি ভাষাতেও লেখা যাবে। হিসাবপত্র সবই রাখতে হবে বাঁধানো খাতায়। কোনও অবস্থাতেই আলগা কাগজ রাখা যাবে না।

গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল প্রধান কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধানের হেফাজতে রাখতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলের সদ্ব্যবহার এবং আয় ও খরচের হিসাব সংরক্ষনের জন্য দায়ী থাকবেন প্রধান কিংবা তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে উপ-প্রধান।

গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিলের অর্থ কাছাকাছি কোন ডাকঘর বা তফসিলিভুক্ত ব্যাঙ্কে বা সমবায় ব্যাঙ্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের নামে সেভিংস একাউন্টে জমা রাখতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের ছোটখাটো খরচ মেটাবার জন্য, প্রধান বা তাঁর অনুপস্থিতির উপ-প্রধান কিছু টাকা নিজের হাতে রাখতে পারবেন। কিন্তু তা ৫০০ টাকার বেশী হবে না।

ব্যঙ্কে বা ডাকঘরে গচ্ছিত গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিলের পাশ বই সচিবের জিম্মায় থাকবে। প্রধান বা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধানের আদেশ ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল থেকে কোনও টাকা খরচ করা যাবে না। ব্যাঙ্কের চেক প্রধান এবং উপ-প্রধান দুজনকেই সই করতে হবে। যদি এঁদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত থাকেন তবে সে-ক্ষেত্রে তাঁর বদলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য একজন সদস্য সই করবেন। কোন সদস্যের এই ক্ষমতা থাকবে, তা গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিংএ ঠিক করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দুজনের সই ছাড়া চেক কাটা যাবে না।

গ্রাম পঞ্চায়েতকে আয় ও ব্যয়ের রোজকার হিসাব রাখার জন্য একটি ক্যাশ বই রাখতে হবে। সচিব এই ক্যাশ বই লিখবেন এবং আয় ও ব্যয় বিষয়ে রসিদ রেখে দেবেন। সচিব যদি অনুপস্থিত থাকেন কিংবা তাঁর পদটি যদি খালি থাকে তাহলে এই দায়িত্ব পালন করবেন কর্মসহায়ক। দুজনেই যদি অনুপস্থিত থাকেন তবে সে-ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত মিটিং করে কোন সদস্যকে এই দায়িত্ব দিতে পারেন। প্রধান কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান অর্থাৎ যিনি তহবিলের দায়িত্বে থাকবেন তিনি নিজে কখনও ক্যাশ বই লিখতে পারবেন না কিংবা আয় ও

ব্যায়ের রসিদ তাঁর হেফাজতে রাখতে পারবেন না। কিন্তু তিনি ক্যাশ বইতে লিখিত আয় ব্যায়ের হিসাব পরীক্ষা করে প্রত্যেকটি লিখনের পাশে স্বাক্ষর দেবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত যখনই কোনও টাকা পাবে (আয় হিসাবে), তার প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফর্মে রসিদ দিতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের যাবতীয় কেনাকাটা করার জন্য একটি কমিটি তৈরি হবে। তাতে থাকবেন প্রধান, উপ-প্রধান, সচিব ও একজন সদস্য পঞ্চায়েত বিরোধী সদস্য থাকলে এ কমিটিতে তাদের একজন প্রতিনিধি রাখতে হবে। কোন সদস্য এই কমিটিতে থাকবেন তা মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক করতে হবে। জরুরী ক্ষেত্রে প্রধানের নির্দিষ্ট আর্থিক ক্ষমতা বলে ওই কমিটির অনুমোদন ছাড়াই কেনাকাটা করা যাবে। এরকম যদি হয় তবে পরবর্তীকমিটি মিটিং-এ অবশ্যই অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। বিশেষ জরুরী ক্ষেত্র ছাড়া প্রধান এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না।

কোটেশন ও টেন্ডার

একশত টাকা পর্যন্ত সামগ্রী কেনাকাটা করার জন্য কোননও দরপত্র বা কোটেশন নেবার প্রয়োজন নেই। ওই টাকার বেশী বিভিন্ন সময়ে সরকারী আদেশবলে নির্দিষ্ট অঙ্ক পর্যন্ত মূল্যের সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে শীলমোহর যুক্ত টেন্ডার বা দরপত্র নিতে হবে।

সরকারী আদেশবলে নির্দিষ্ট টাকার অঙ্কের বেশী সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে শীলমোহর যুক্ত টেন্ডার বা দরপত্র নিতে হবে।

দরপত্র বা কোটেশন নিলে প্রকৃত বাজার দরটি জানা যায়। জিনিস কিনতে গিয়ে ঠকার আশঙ্কা কম থাকে।

গ্রাম পঞ্চায়েত যদি কোনো কাজ সমবায় সমিতিকে দিয়ে করাতে চান তবে সেই ক্ষেত্রে টেন্ডারের প্রয়োজন হবে না। দর-দাম গ্রাম পঞ্চায়েত ঐ সমবায় সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করবেন। ওই কাজের জন্য যে আনুমানিক ব্যায় হয়েছে, কোনও সময়েই তার বেশী টাকা ব্যায় করা যাবে না।

গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য যে জিনিসই কেনা হোক না কেন, তা স্টক বইতে লিখে রাখতে হবে।

নীলাম

সময় বিশেষ গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্থাবর দ্রব্যাদি বিক্রয় করবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় যে অস্থাবর দ্রব্য বিক্রয় করা হবে তার দাম যদি পাঁচশত টাকার বেশী হয় তাহলে নির্দিষ্ট কমিটিকে দিয়ে প্রকাশ্যে নীলাম করে সব চেয়ে বেশী দর যিনি দেবেন তাঁকেই বিক্রি করতে হবে। নীলামের জন্য সাত দিনের একটি নোটিশ দিতে হবে। নোটীশে নীলামের স্থান, দিন, সময় যে জিনিস বিক্রি করা হবে তার তালিকা ও নীলামের নিয়মাবলী লেখা থাকবে।

অগ্রিম অর্থ

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবিধ জনহিতকর কাজ করার জন্য অনেক সময় অগ্রিম অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। যিনি কাজটি দেখাশোনা করেন তাঁকে এই অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে। যে এলাকায় কাজ হবে, সেই এলাকার কোন ব্যাক্তিকে কাজটি দেখাশোনা এবং পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা যাবে। এই নিযুক্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিংএ অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। কাজটি দেখাশোনা ও পরিচালনার করার জন্য নিযুক্ত ব্যাক্তিতে অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মোট মজুরি বাবদ ব্যায়ের এক-চতুর্থাংশের বেশি এককালীন অগ্রিম দেওয়া যায় না। যথাযথভাবে কাজটি করার জন্য এবং অগ্রিম হিসাবে নেওয়া টাকা সঠিক হিসাব বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। মাস্টার রোল, ভাউচার এবং উদ্বৃত্ত টাকা সহ অন্যান্য নথিপত্র তিন মাসের মধ্যেই তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে জমা দেবেন। কোনও ক্ষেত্রেই একবার অগ্রিম নিলে, সেই টাকার হিসাব না বুঝিয়ে দেওয়া পর্যন্ত পুনরায় অগ্রিম দেওয়া যাবে না। যিনি অগ্রিম অর্থ নেবেন তাকে একটা প্রতিজ্ঞাপত্র দিতে হবে। যখন কাজটি হবে তখন তা যাতে ভালোভাবে হয় তার জন্য উপযুক্ত তদারকি করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসহায়ক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এই তদারকির কাজ করবেন।

হিসাবপত্র নিরীক্ষা বা অডিট

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি আয় এবং ব্যায় নিয়মমাফিক হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য সরকারী আধিকারিকদের দ্বারা হিসাবপত্র নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। নিরীক্ষা দুরকমের হয়, একটি বিধিবদ্ধ এবং বাৎসরিক, অন্যটি আভ্যন্তরীন এবং ত্রৈমাসিক।

বিধিবদ্ধ অডিট

গ্রাম পঞ্চায়েতের আয় ব্যায় এবং প্রতিদিনের হিসাব পঞ্চায়েত সচিব যথাযথভাবে লিখে রাখবেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের যাবতীয় হিসাব পঞ্চায়েত সম্প্রসারন আধিকারিক অর্থাৎ ই.ও.পি বছরে অন্তত একবার পরীক্ষা করবেন। অডিটর গ্রাম পঞ্চায়েতের যাবতীয় রেজিস্টার, রসিদ বই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনে সকল কাগজপত্র অডিটরকে দেখাতে হবে। অডিট শেষ হবার দুই মাসের মধ্যে অডিটর তার রিপোর্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানকে পাঠাবেন। অডিট রিপোর্টের একটি কপি জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক ও পঞ্চায়েত অধিকর্তার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছেও যাবে। অডিট রিপোর্টে অডিটরের একটি প্রতিবেদন থাকবে। এই প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকবে।

১। গ্রাম পঞ্চায়েত কত টাকা অনুদান হিসাবে পেয়েছে এবং এই অনুদান থেকে কত টাকা খরচ করেছেন ;

২। গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকা খরচ করতে গিয়ে, কোনও অন্যায় বা গুরুতর অনিয়ম হয়েছে কিনা অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাপ্য টাকা অনাদায়ী হয়ে পড়ে আছে কিনা ;

৩। গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও আর্থিক লোকসান হয়েছে কিনা।

অডিট রিপোর্টটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিংএ পেশ করতে হবে এবং রিপোর্ট পাবার দু মাসের মধ্যে রিপোর্টের যে সব অনিয়ম বা ত্রুটির উল্লেখ আছে, তা সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। অনিয়ম বা ত্রুটি সংশোধন করে কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, তা অডিটরকে ওই দু মাসের মধ্যে জানাতে হবে। যদি কোন কারনে ত্রুটি বা অনিয়মগুলি সংশোধন করা সম্ভব না হয় তবে সেই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্তব্য অডিটরকে জানাতে হবে।

অডিট রিপোর্ট খুব গুরুত্বপুর্ন। এটি পাবার পর কালবিলম্ব না করে মিটিংএ পেশ করা উচিত। মিটিংয়ে রিপোর্টের উপর বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। এতে প্রধানের এবং অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব আছে। অনিয়ম বা ত্রুটি হয়ে থাকলে যথাশীঘ্র সম্ভব সংশোধন করা উচিত যদি কোনও গুরুতর ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে, যাঁর বা যাঁদের জন্য এই ত্রুটি হয়েছে তাঁকে বা তাঁদের এর জন্য পূর্ন দায়িত্ব নিতে হবে।

আভ্যন্তরিন অডিট

ই.ও.পি দ্বারা গ্রাম পঞ্চয়েতের বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও আরও একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চয়েতের হিসাব রাখার পদ্ধতিগত পরামর্শ দেবার এবং আয়-ব্যায় সংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাকে আভ্যন্তরীন অডিট বলা হয়। পঞ্চয়েত একাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার এই কাজটি করেন। তিনি মাসে অন্তত একবার এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চয়েত অফিসে যাবেন। তিনি গ্রাম পঞ্চয়েতের হিসাব পরীক্ষার পর মাসিক রিপোর্ট দেবেন। এছারাও প্রত্যেক বছর ৩০ শে জুন, ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ৩১ শে ডিসেম্বর এবং ৩১ শে মার্চ এ চারটি ত্রৈমাসিক অডিট রিপোর্ট দেবেন। তাঁর এই রিপোর্ট গ্রাম পঞ্চয়েতের পরবর্তী মিটিংএ সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো দরকার।

মাসিক এবং ত্রৈমাসিক অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী, গ্রাম পঞ্চয়েত ভুল-ত্রুটিগুলির প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন। বিধিবদ্ধ অডিট হবে আর্থিক বছর হবার পর অর্থাৎ সমস্ত জমা খরচের হিসাব হয়ে যাবার পর, আর ধারাবাহিক বা আভ্যন্তরিন হিসাব পরীক্ষা সারা বছর ধরেই চলবে, যার ফলে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংশোধধন করে নেওয়া যাবে।

সামাজিক নিরীক্ষা

গ্রাম পঞ্চয়েতের প্রকৃত দায়বদ্ধতা তাদের নির্বাচকদের কাছে বা তাদের মাধ্যমে এলাকার সমস্ত মানুষের কাছে। তাই পঞ্চয়েতের কাজ কর্মের প্রকৃত স্বচ্ছতা বিচার করবেন এলাকার জনগন। মানুষের দ্বারা পঞ্চয়েতের কাজ কর্মের এই মূল্যায়নের নামই সামাজিক নিরীক্ষা। এই নিরীক্ষা হবে গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার অধিবেশনে।

গ্রামসংসদ ও গ্রামসভা

প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক নির্বাচন ক্ষেত্র বা ওয়ার্ড থাকে। ওই নির্বাচন ক্ষেত্রগুলোকে গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসংসদ বলে। যাঁরা ওই এলাকার ভোটার তাঁরা সবাই ওই গ্রামসংসদের সদস্য। আইনে নির্দেশ দেওয়া আছে যে প্রত্যেক গ্রামসংসদ এলাকায় সাধারনত মে মাসে একটি বার্ষিক সভা এবং নভেম্বর একটি ষান্মাসিক সভা করতে হবে। এছাড়া একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সব ভোটটারকে সদস্য করে একটি গ্রামসভা আছে। এই গ্রামসভার প্রতি বছর সাধারনত ডিসেম্বর মাসে একটি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ষান্মাসিক ও বার্ষিক সভা

ওই সভার অন্তত সাত দিনের আগে ঢেঁড়া পিটিয়ে যতটা বেশি করে সম্ভব হয় সভার কথা, স্থান, দিন ও সময় ঘোষনা করে জনসাধারনের মধ্যে প্রচার করতে হবে। সভার নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসেও টাঙিয়ে দিতে হবে। বার্ষিক সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট ও আগের বছর যে কাজ হয়েছে ও পরের বছর যে যে কাজ হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে সে সম্পর্কিত রিপোর্ট আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে এবং সবার প্রস্তাব ও সুপারিশ অনুযায়ী পরিবর্তন বা সংশোধন করে নিতে হবে। ষান্মাসিক সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষার সর্বশেষ রিপোর্ট পেশ করতে হবে। সভায় উপস্থিত ব্যাক্তিরা সম্মত হলে গ্রাম পঞ্চায়েত সংক্রান্ত অন্য বিষয়ও ওই বার্ষিক বা ষান্মাসিক সভায় আলোচচনা করা যাবে। গ্রাম সংসদের মিটিংয়ে গৃহীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব যথাযথভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিংয়ে বিবেচনা করতে হবে। ওই প্রস্তাবগুলির বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কী সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা নিলেন, তা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাৎসরিক রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে।

সাধারনত প্রধান কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান গ্রামসংসদের মিটিংয়ে সভাপতি হবেন। দুজনের অনুপস্থিতিতে ওই নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত কোনও সদস্য সভার সভাপতি হবেন। নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে দুজন নির্বাচিত সদস্য থাকলে যিনি বয়সে বড় তিনি সভাপতি হবেন।

গ্রামসভার বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান বা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান সভাপতি হবেন। গ্রামসংসদের সব আলোচ্য বিষয়ই গ্রাম সভায় আলোচনা করা যাবে। আলোচিত বিষয়গুলি

গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং-এ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাৎসরিক রিপোর্টে এর উল্লেখ থাকবে।

গ্রাম সংসদের মুল কাজগুলি সংক্ষেপে পেশ করা হলঃ

ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরন বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত যে যে প্রকল্প গ্রহন করেছে বা করবে সে বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা ;

খ) গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহন করার জন্য প্রকল্প চিহ্নিত করা বা চিহ্নিত করার জন্য নীতি নির্ধারন করা ;

গ) বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরন প্রকল্পের আওতায় আসতে পারে এমন পরিবার বা ব্যাক্তিদের চিহ্নিত করা।

ঘ) গ্রাম সংসদ এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পে জনসাধারন যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে সেগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারসমুহের সমবন্টন সুনিশ্চিত করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক প্রকল্পের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নন এমন অনধিক নয় জন ব্যাক্তিকে নিয়ে কমিটি (বেনিফিসিয়ারি কমিটি) গঠন করা ;

ঙ) সমষ্টিকল্যান, বয়স্কশিক্ষা, পরিবারকল্যান এবং শিশুকল্যান সম্পর্কিত প্রকল্পগুলিতে সাধারনের অংশগ্রহনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা ;

চ) জাতি ধর্ম নিবিশেষে সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর লোকের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সংহতিবোধ জাগিয়ে তোলা ; এবং

ছ) এলাকার জনসাধারনের অংশগ্রহনে ছাড়া কোন প্রকল্প রুপায়নে বা কোনো প্রকল্প রূপায়নে ব্যর্থতার জন্য প্রধান বা কোনো সদস্যের ভূমিকা থাকলে সে বিষয়ে আপত্তি লিপিবদ্ধ করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী

গ্রাম পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজকর্ম করার জন্য একজন সচিব ও একজন সহায়ক থাকবেন। প্রথম জনের নিয়োগকর্তা জেলাশাসক এবং দ্বিতীয়জনের নিয়োগকর্তা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান।

এছাড়াও আছেন একজন কর্মসহায়ক, যাকে নিয়োগ করবেন প্রধান। কর্মসহায়ক প্রধানত স্কীম সংক্রান্ত কাজকর্ম করবেন।

এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন কিংবা দুজন কর আদায়কারী থাকবেন। কর আদায়কারীর কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধার্য কর আদায় করা। আদায়কারী কমিশনের বিনিময়ে কাজ করবেন। এছাড়া তিনি একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভাতা হিসাবে পাবেন।

এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্মচারী হলেন দুজন বা তিনজন গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী। দফাদার বা চৌকিদার যাঁরা ছিলেন তাঁদেরই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে কিছু দফাদার বা চৌকিদার স্বেচ্ছায় পুর্বপদেই আছেন। এরপরে অবশ্য শূন্যপদে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী হিসাবেই নিয়োগ হবে। এদের নিয়োগকর্তা হলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।

কমচারীদের ছুটি

পঞ্চায়েতকর্মী, সহায়ক, সচিব ও কর্মসহায়ক বছরে ১৪ দিন পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি পাবেন। সাধারনত এই ছুটি টানা সাত দিনের বেশী হবে না। এই ছুটি মঞ্জুর করবেন প্রধান। এছাড়া যে নিয়মে সরকারী কর্মচারীরা নানা রকম ছুটি পেয়ে থাকেন সেই নিয়মে সচিব, সহায়ক এবং কর্ম সহায়ক ওইসব ছুটি পাবেন। এই ধরনের ছুটি প্রধানের সম্মতি নিয়ে বি.ডি.ও মঞ্জুর করবেন।

কমচারীদের বেতন

গ্রাম পঞ্চায়েত কমচারী যথা সচিব, কর্মসহায়ক, সহায়ক এবং কর্মী প্রত্যেককেই যথাসময়ে বেতন দেবার ব্যবস্থা করা গ্রাম পঞ্চায়েতের আবশ্যিক কর্তব্য। এঁদের বেতনের টাকা রাজ্য সরকার কতৃক পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়ে থাকে। এবং ওই টাকা বি.ডি.ও মারফৎ পাওয়া যায়। গ্রাম পঞ্চায়েত বিল করে ওই টাকা তুলবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বেতন বিলির নির্দিষ্ট খাতা রাখতে হবে। অনুদান যথাযথ ব্যয় করা হয়েছে এই মর্মে নির্দিষ্ট ফরমে সার্টিফিকেট জুন মাসের বিলের সঙ্গে প্রতি বছর দিতে হবে।

কমচারীদের কাজ

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের কারকি কাজ এ সম্পর্কে এই পুস্তিকার দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদভাবে বলা হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, সচিব এবং পঞ্চায়েত সহায়কের দায়ীত্ব হোল গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস পরিচালন, হিসাবপত্র রাখা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজকর্মে পঞ্চায়েতকে সহায়তা করা। কর্মসহায়কের কাজ মূলত পঞ্চায়েতের কাজকর্মের কারিগরি দিকটিতে সাহায্য করা এব। পঞ্চায়েতকর্মীর কাজ হোল চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী ও নাইটগার্ডের দায়িত্ব পালন করা।

সপ্তম অধ্যায়

প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্য

ভাতা

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান রাজ্য সরকারের নির্ধারিত হারে ভাতা পাবেন এবং সদস্যরা নির্দিষ্ট ভ্রমন ভাতা পাবেন।

প্রধান ও উপপ্রধানের ছুটি

গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রধান, উপপ্রধান বা অন্য কোনও সদস্যকে অনুপস্থিতির জন্য বছরে তিন মাস পর্যন্ত ছুটি দেওয়া যেতে পারে। বছর বলতে বোঝাবে জানুয়ারী মাস থেকে ডিসেম্বর মাস। ছুটি মঞ্জুরির খবর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক এবং জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিককে জানাতে হবে। অবশ্য, গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাউকে তিন মাসের বেশীও ছুটি দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অতিরিক্ত ছুটির সময়ের জন্য সাম্মানিক বা ভাতা (যা তার সাধারনতঃ প্রাপ্য) পাবেন না। শুধু তিনি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেন নি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় যোগদান করেন নি এ রকম কোন অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা যাবে না। আবার, অনুমোদিত ছুটি শেষ হবার আগেই তিনি যদি কাজে যোগ দিতে চান, তিনি পারবেন এবং অনুমোদিত ছুটির মেয়াদও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রধান ও উপ-প্রধান অপসারন

যদি রাজ্য সরকারের বিবেচনায় কোনো প্রধান অথবা উপপ্রধান ইচ্ছাকৃতভাবে পঞ্চায়েত আইন বা নিয়মাবলী অনুসারে প্রচারিত আদেশ অমান্য করেন কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, সে-ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট প্রধান বা উপ-প্রধানকে তাঁর পদ থেকে অপসারন করতে পারবে। এর জন্য রাজ্য সরকার একটি নির্দিষ্ট আদেশ জারি করবে এবং কোন দিন থেকে প্রধান বা উপ-প্রধান অপসারিত হলে তা ওই আদেশে বলা থাকবে। অবশ্য এরকম আদেশ জারি করার সিদ্ধান্ত নেবার আগে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিকে তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেবে।

সদস্যদের দ্বারা প্রধান/উপ-প্রধান অপসারন

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান ও একজনকে উপ-প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করেন। সুতরাং প্রধান বা উপপ্রধান ততদিনই তাঁদের পদে থাকতে পারবেন, যতদিন ওঁদের উপর সেই সদস্যাদের আস্থা আছে। যদি সেই আস্থা নষ্ট হয়ে যায়, তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বিশেষভাবে ডাকা মিটিংয়ে বেশীর ভাগ সদস্যদের মত নিয়ে প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারন করা যায়। যার বিরুদ্ধে অপসারনের প্রস্তাব আনা হয়েছে, তিনি এই বিশেষ মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করতে পারবেন না। যদি অনাস্থা প্রস্তাব দুজনের বিরুদ্ধেই হয়, তাহলে সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে মিটিংয়ের সভাপতি হিসাবে মনোনয়ন করবেন। এই মিটিংয়ে সভাপতির কোন নির্ণায়ক বা কাস্টিং ভোট নেই। স্থানীয় বি.ডি.ওর কাছে এ-রকমের মিটিংয়ের নোটিশের কপি দিতে হবে। অবশ্য প্রধান বা উপ-প্রধান নির্বাচিত হওয়ার দিন থেকে এক বছরের মধ্যে তাঁকে অপসারন করার কোন প্রস্তাব আনা যাবে না। আবার একবার কোন অপসারনের প্রস্তাব যদি সবায় প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে ৬ মাসের মধ্যে এই রকম কোন প্রস্তাব আনা যাবে না।

প্রধান/উপ-প্রধানের শূন্যপদ পুরন

মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারন বা অন্য কোনও কারনে প্রধান বা উপ-প্রধানের পদে হঠাৎ শূন্যতার সৃষ্টি হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টির দিন থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যেই শূন্যপদ পূরনের জন্য, অর্থাৎ প্রধান বা উপ-প্রধান নির্বাচনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং ডাকতে হবে। এই মিটিং নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বি.ডি.ও ডাকবেন।

সদস্যের পদত্যাগ এবং অপসারন

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য লিখিতভাবে বি.ডি.ওকে জানিয়ে সদস্যপদে ইস্তফা দিতে পারেন। বি.ডি.ও যেদিন পদত্যাগপত্র গ্রহন করবেন, সেদিন থেকে ওই সদস্য পদত্যাগ করেছেন বলে ধরে নিতে হবে। যেদিন ওই সদস্য পদত্যাগ করেছেন, তার ৩০ দিনের মধ্যে ওই খবর বি.ডি.ও সব সদস্যদের জানিয়ে দেবেন। এছারাও মহকুমা-শাসক নিম্নলিখিত কারনে কোনও সদস্যকে অপসারন করতে পারেনঃ

ক) নির্বাচনের পর যদি কোনও সদস্য নৈতিক অপরাধের জন্য ফৌজদারী আদালত কর্তৃক

আইনের এমন ধারায় দন্ডিত হন, যে ধারায় ছয় মাসের বেশী করাদন্ড দেওয়া যায় ;

খ) কী অবস্থায় অথবা কী কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়া যায় না আইনে বলা আছে। যদি দেখা যায় যে নির্বাচনের সময়ে, কোনও নির্বাচিত সদস্যের এমন ধরনের অযোগ্যতা ছিল যা থাকলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় না ;

গ) নির্বাচনের সময়ে কোনও সদস্যের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা ছিল, কিন্তু নির্বাচিত হবার পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হোয়ার ফলে তিনি সদস্য পদের অযোগ্য হয়ে পরেছেন।

ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও অনুমতি ছাড়া যদি তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরপর তিনটি মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকেন ;

ঙ) তিনি যদি পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী কোনও বকেয়া কর, শুল্ক ফি বা অভিকর না দিয়ে থাকেন ;

চ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন সদস্য যদি পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, তবে তিনি যে-দিন থেকে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য বলে ঘোষিত হবেন সেই দিন থেকে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থাকতে পারবেন না ;

ছ) যদি কোনও সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনক্ষেত্রে সমগ্র এলাকা কোনও পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে যে দিন থেকে এই অবিভক্ত কার্যকরী হচ্ছে সে দিন থেকে ওই এলাকা থেকে নির্বাচিত সদস্য আর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থাকতে পারবেন না।

রাজ্য সরকার কতৃক গ্রাম পঞ্চায়েতের সিধ্যান্ত বাতিল করা

রাজ্য সরকার লিখিত অদেশের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও সিধ্যান্ত নিম্নলিখিত কারণে প্রত্যাহার করে নিতে পারবে-

ক) যদি সরকার মনে করে যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও সিধ্যান্ত বা প্রস্তাব আইনানুসারে গৃহীত হয় নি ;

খ) যদি সরকার মনে করে যে, কোনও গৃহীত সিধ্যান্তে পঞ্চায়েত আইন ও নিয়মে প্রদত্ত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করা হয়েছে।

কোনও প্রস্তাব বা সিন্ধান্ত প্রত্যাহার করার আগে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে ওই সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেবেন রাজ্য সরকার।

গ্রাম পঞ্চায়েতের আদেশ স্থগিত রাখা

নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও সিদ্ধান্ত বা আদেশ বা কোন কাজ আইন-বহির্ভূত অথবা এই ধরনের সিদ্ধান্ত, আদেশ বা কাজ গুরুতর শান্তিভঙ্গের কারন হতে পারে কিংবা মানুষের গুরুতর ক্ষতি বা অসুবিধার কারন হতে পারে, তাহলে ওই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের আদেশ বা প্রস্তাব বা কাজ কার্যকরী করা স্থগিত রাখতে পারেন। নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুরূপ আদেশ দিলে তিনি সেই আদেশের কারন ব্যাখা করে একটি রিপোর্ট সহ আদেশের কপি রাজ্য সরকারের কাছে সঙ্গে সঙ্গে পাঠাবেন। রাজ্য সরকার ওই আদেশটি বাতিল করতে পারে কিংবা নির্দেশ দিতে পারে যে আদেশটির সংশোধিত আকারে কিংবা বিনা সংশোধনে, বরাবরের জন্য, অথবা যে সময়ের জন্য চলা সমীচিন, সে সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত বাতিল

রাজ্য সরকার যদি মনে করে যে, কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত আইন নির্দেশিত কর্তব্য পালনে অযোগ্যতা দেখিয়েছে কিংবা ক্রমাগতভাবে কর্তব্য পালনে ত্রুটি প্রদর্শন করেছে অথবা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেছে, তাহলে রাজ্য সরকারী গেজেটে কারন উল্লেখ করে আদেশ দিয়ে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাতিল করে দিতে পারে। রাজ্য সরকার বাতিলের আদেশ দেবার আগে ওই আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য জানাবার সুযোগ গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেবে।

অষ্টম অধ্যায়

একনজরে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনা সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী

১) পঃবঃ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩

২) পঃবঃ পঞ্চায়েত নিয়মাবলী, ১৯৫৮

৩) পঃবঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়মাবলী, ১৯৭৪

৪) পঃবঃ পঞ্চায়েত গঠন নিয়মাবলী, ১৯৭৫

৫) পঃবঃ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়মাবলী, ১৯৮১

৬) পঃবঃ পঞ্চায়েত উপবিধি নিয়মাবলী, ১৯৮৬

৭) পঃবঃ গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাব ও নিরীক্ষা নিয়মাবলী, ১৯৯০

৮) পঃবঃ পঞ্চায়েত বাজেট নিয়মাবলী, ১৯৯৬

কয়েকটি সহায়ক বই

১) উন্নয়নের বিকল্প পথঃ ভূমিসংস্কার - ডঃ সূর্য্যকান্ত মিশ্র

২) শ্রেনী দৃষ্টিভঙ্গিতে পঞ্চায়েত - ডঃ সূর্য্যকান্ত মিশ্র

৩) প্রসঙ্গ পঞ্চায়েত - ডঃ প্রভাত দত্ত

৪) ভারতীয় রাজনীতির ত্রিধারা - ডঃ প্রভাত দত্ত